কি দাদা, ঘিরে থাকবেন নাকি!

বনি আমিন

বাসরের ফুল শুকিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে কবে, তবুও স্বাধ 'বিলম্বিত মধুচন্দ্রিমা' ভারতের সীমলা অথবা দেরাদুনে করবো। আর সেজন্যে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সনে টোনা-টুনি দুজন এক টপ্‌কায় চাটগাঁ থেকে ওপাড়ে কোলকাতায় উড়ে গেলাম। হপ্তাখানেক কোলকাতায় থাকবো তারপর ট্রেনে চেপে ধানবাদ হয়ে ভারত উপমহাদেশের সংগীতের সূতিকাগার লখনৌতে যাবো। লখনৌ'র কিছু বনেদী বাঁঈজির জলসায় নাচ-গান দেখে সেখান থেকে মধুচন্দ্রিমার নামে হাওয়া খেতে সিমলা যাওয়া। এ পরিকল্পনাতেই তিন হপ্তার জন্যে দুজনের ঘর ছাড়া। ভাষাগত কারনে কোলকাতাকে ঘরের বাইরে মনেই হয়নি। তাই টোনা-টুনি আমরা দুজনে গড়ের মাঠে হেঁটে-হেঁটে বাদামের খোসা ছাটা থেকে সুঁড়ুত শব্দে ফুসকা গেলা অথবা চৌরঙ্গির মেট্রো সিনেমার সামনে মশলা মেসানো তাজা ফলের রস পান সবি মহানন্দে উপভোগ করেছিলাম। চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত যখন গড়ের মাঠে, রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গনে অথবা ভিক্টোরিয়া ভবনের আশেপাশে আমাদের সমবয়সী অথবা তারচে নীচু বয়সী কপোত-কপোতিকে মহাবেগে গাঁঘেষে বসে একে অপরকে 'উষ্ণ নিশ্বাস' দিতে দেখতাম। অথচ বিয়ের আগে ঘনিষ্ঠভাবে

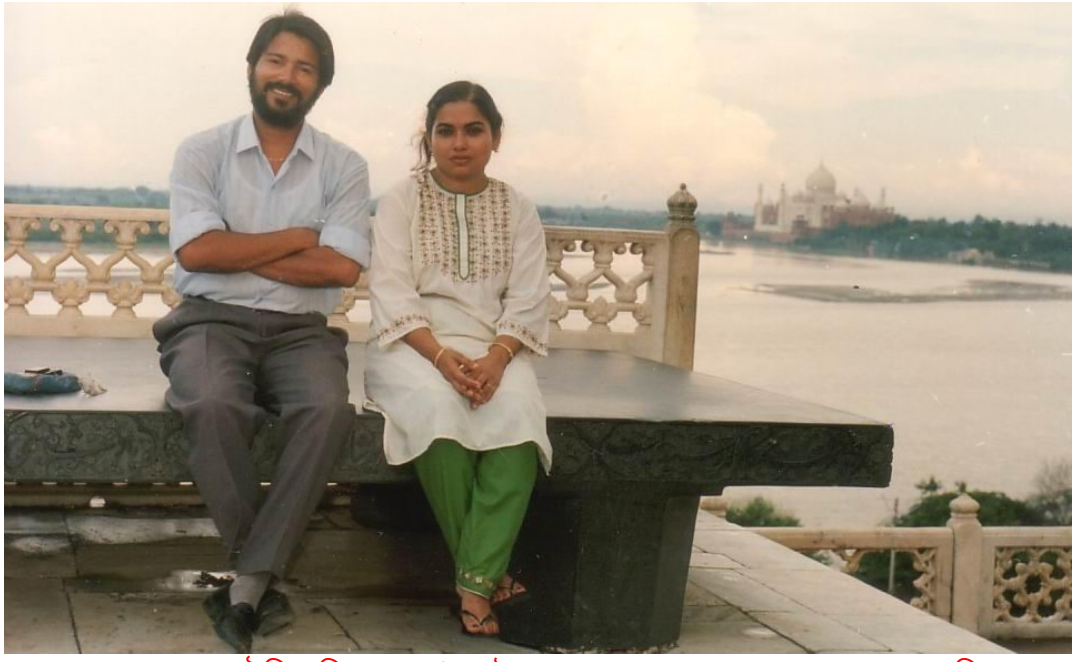

যমুনার ওপাড়ে ঐতিহাসিক প্রেমে'র সৌধ তাজমহল আর এপাড়ে আমরা দু-প্রেমিক

বসে ওদের মতো মধু-কুহকী সুরে আলাপচারিতা করতে নিজ দেশে দুজনে কতো কসরতই না করেছিলাম। সবি ছিল বৃথা। 'কাজল-নয়না' একটি সুন্দরীকে সাথে নিয়ে চাটগাঁতে কেউ পাহাড় ঘেরা কুঞ্জবন ফয়স্ লেক অথবা পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে নিরাপদে দু'দণ্ড কাটাবে সে সুযোগ আশির দশকে তেমন ছিলনা। অগত্যা হরতালের দিনে 'সাংবাদিক বাহানায়' 'সাংঘাতিক'ভাবে মোটর সাইকেলে লাল-ঝান্ডা উড়িয়ে দুজনে দুরে কোথাও ছুটে যেতাম অথবা 'গরীব কেন মরেনা' বা 'স্বামী কেন আসামী' মার্কা ছবি দেখার নামে সিনেমা হলে'র ভেতরেই

নিভৃত আঁধারে দুজনে চীনা বাদামের খোসা ছাটতাম এবং সিনেমা'র গগনবিদারী আওয়াজের সুযোগে পরস্পরে 'উষ্ণ নিশ্বাস' লেনদেনের সুযোগ খুঁজে নিতাম। কোথাও স্থান না হলে কোন সোনালী বিকেলে আর্ট-কলেজের পাহাড়ের পাদদেশে 'ওয়ার্লড ওয়ার সিমেট্রি'র সবুজ গালীচায় এক-দম বসার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটে যেতাম। বেশী ঘনিষ্ঠ দেখলে 'ঠ্যাক্ পার্টি' অথবা 'পুলিশ পার্টি'র কাছে নির্ঘাত ইজ্জত বন্ধক দিয়ে আসতে হবে ভেবে অসংকুচিত ভালোবাসার হৃদয়টি আমার সদা সংকুচিত হয়ে থাকতো। আবেগভরা চোখটি প্রিয়ার চোখে আর বাস্তবের অন্যচোখটি বাহির জগতে রেখে ব্যঘ্র আক্রমনে শংকিত নিরীহ হরিণীর মতো 'কুটু - কুটু' করে নিঃশব্দে কত কথাই না বলতে চেষ্টা করতাম।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আঙ্গিনায় টোনা-টুনি আমরা দুজন

তখন সবচেয়ে নিরাপদ মিলনমেলা ছিল চাটগাঁর বিখ্যাত নিউমার্কেট। সেখানে মুখোমুখি বসে লিবার্টিতে এক স্কুপ আইসক্রীম ঘন্টা লাগিয়ে চেখে অতপরঃ দু-চার পাঁক চক্কর দিয়ে অতৃপ্ত বাসনায় দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ঘরে ফেরা অভ্যাসটি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। কোলকাতায় ওদের দেখে আমরা দুজনে তাই বড় ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, ওদের এতো স্বাধীনতা থাকলে আমাদের কেন নেই, একই ভাষায় কথা বলি, ওদের পুরুষরাও ঘরে আড়াই-হাত ঘের এর লুঙ্গি পরে অথবা সাড়ে দশ-হাতের শাড়ি পেঁচিয়ে আমাদের মত ওদের নারীরাও তাদের আব্রু ঢাকে। তবে এ ব্যবধান কেন? লজ্জায় কাউকে জিজ্ঞেস করিনি, তাই উত্তরও পাইনি কখনো।

দু'দিন পর টালিগঞ্জের ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী'র একটি সিনেমা'র শ্যুটিং দেখার জন্যে আমাদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর - বন্ধু নায়িকা ইন্দ্রানী হালদার আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। ষ্টুডিওতে দেখলাম বাংলাগানের 'নুর' শ্যামা-সুন্দরী সন্ধ্যা মুখপধ্যায়ও সেখানে। কি কারনে যেন তিনি সেদিন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এসেছিলেন। কবি জসীম উদ্দিন ও তার কক্ষসাথী আব্বাস উদ্দিন চল্লিশ দশকের প্রখ্যাত শিল্পী আঙুরবালা দেবীকে নাদেখে মনের আঁখরে যেভাবে কল্পনা করে ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে, ঠিক সেভাবে আমরা দুজন আমাদের কল্পনার রানীকে কাছথেকে দেখে হোঁচট খেলাম, তবু আমরা দুজন এগিয়ে গেলাম তার পানে। ওপাড় থেকে এসেছি শুনে 'কেমন আছো তোমরা' মিটিমিটি হাসিতে জানতে চাইলেন সন্ধ্যাজি। আমার সহধর্মিনি উচ্ছাসভরে বলে উঠলো, 'ভালো, চন্দন পালঙ্কে একা একা নই, দুজনে একসাথেই আছি'। সন্ধ্যাজি ওর উপস্থিত উত্তরে হেসে কুটি-কুটি।

টালিগঞ্জের ষ্টুডিও'র কাছাকাছি রাস্তার মোড়ে মহানায়ক উত্তম কুমারের বিরাট এক ভাস্কর্য্য। তার পাদদেশে দুজনে দু'টি বসরাই গোলাপ অঞ্জলি দিয়ে আনমনে আউড়ে গেলাম, 'গুরু, নয়নভরে তোমার ভালোবাসার উদ্যান কোলকাতাকে দেখেছি, খুঁজে পেয়েছি কোথায়, কোন মধুকুঞ্জে তুমি তোমার সিনেমার নায়িকাদের নিয়ে প্রেমলীলা করেছিলে।' একইসাথে তখন বারবার আমার মনে পড়েছিল যে এ মহানায়কের প্রস্থানে কত অযুত বাঙ্গালী রমনী দ্বিতিয়বার 'মানসিক-বৈধব্য' বরন করে নিয়েছিল। কিছুদুর হেঁটে দুজনে ফের উত্তরমুখী ট্রামে চাপলাম, ভাবলাম ইদুঁরের মতো মাটির সুড়ঙ্গ দিয়ে না গিয়ে এবার দুপাশ দেখে দেখে এ্যাসপ্লানেডে আমাদের ঢেরায় ফিরবো। ট্রামের আড়াই-সীট প্রশস্থ একটি বেঞ্চি দখল করে বাংলাদেশী অভ্যাসে ঝাঁপিয়ে দুজনে বসে গেলাম। বাইরে জানালা দিয়ে দেখবো কি, একজন আরেকজনকে আগলে ধরে চোখে চোখ রেখে ঢুলতে ঢুলতে ট্রামে চল্লাম। কিছুক্ষন পর কালীঘাটে'র কাছাকাছি যখন আসলাম পেছন থেকে কে যেন মিহী সুরে বলছে, 'কি দাদা, ঘিরে থাকবেন নাকি?' ট্রামের লক্কর-ঝক্কর শব্দে ঐ মিহীসুরটি বার বার মিশে যাচ্ছিল। বুঝিনি কোত্থেকে ঐ কণ্ঠটি ভেসে আসছিল, পুনরায় 'কি দাদা . . ?' ওর কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে পেছন ফিরে দেখলাম বিপুলাকৃতির নাদুসনুদুস সুন্দরী এক তরুনী আমাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো পেছন থেকে বলছেন। তিনি আমাদের আড়াই-সীটে বসতে চাইছেন। তাই বলছেন আমি যেন আমার সুন্দরী সহধর্মিনিকে বাহুডোর থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে পাশে বসার সুযোগ করে দেই। আশ্চর্য্য হলাম এখানকার নারীদের দাবী আদায়ের কণ্ঠ শুনে। আমরা দুজনে পাটি সাঁপটা পিঠার মত সেঁঠে ঐ মহিলাটিকে পাশে বসতে দিলাম। ভাবলাম, বাংলাদেশে এমনটি করে কেউতো বলবেনা, 'কি দাদা . . ?" মানসপটে ভেসে উঠলো কত নিরীহ ছাত্রীদের চেহারা। যারা চট্টগ্রাম শহর থেকে একহাতে বইখাতা নিয়ে আরেক হাতে ঝুলন্ত হাতল ধরে শহর থেকে এক ঘন্টার দীর্ঘ ১২ কিঃমিঃ পথে কত কষ্ট ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে মুখবুজে প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ক্লাশ করছে। রাবনরূপী কোন মাস্তান যুবক যদি তিনসীটকে একসীট করে হাত-পা ছড়িয়ে শ্যাটল

টালিগঞ্জ থেকে দমদম এয়ারপোর্ট অবদি বেশ কয়েকটি সরকারী শহর এলাকার বাসে মহিলা বাস কন্ডাকটার। ২০০৫ থেকে পঃ বঙ্গে নারীদের কর্মসংস্থানের সুবিধা হিসেবে এ ব্যবস্থা শুরু হয়েছে।

ট্রেনে বসে তবুও ঘুনাক্ষরে কোন সীতাবতী ছাত্রী 'টুঁ' শব্দটি করবেনা। চিরাচরিত নিয়মে নীরবে সয়ে যাবে সকল যাতনা।

মধ্যহ্ন আহার সফদার ষ্ট্রিটের কাছাকাছি 'কস্তুরী' নামে একটি রেষ্টুরেন্টে সেরে সোজা হোটেলে চলে গেলাম বিশ্রামের জন্যে। বিকেলে আবার বন্ধু অজয় কর্মকারের অনুরোধের ঢেঁকি গিলতে ডিনারে যেতে হবে বিবাদিবাগ (বিনয়, বাদল ও দিনেশ বাগ)। ওর স্ত্রী নমীতা কর্মকার চাটগাঁতে আমার অর্ধাঙ্গিনীর সাথে একসাথে একই স্কুলে পড়েছিল। নমীতা অজাতে প্রেম নিবেদন করে জাত খোয়াতে বসেছিল প্রায়। এ আশংকা দেখে তড়িঘড়ি ওপাড়ে বিবাদিবাগের অজয়ের কাছে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা কন্যা-সম্প্রদান করে ধর্মরক্ষা করেছেন। অতপরঃ নমিতাকে ঠেলে কোলকাতা পাঠিয়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেছেন গোবেচারা পিতা দিলীপ রায়চৌধুরী। বাংলায় প্রবাদ আছে, 'মেয়েরা মা'য়ের ছায়া'। নমিতা'র গুনবতী মা সুরঞ্জনা দেবীও মধ্যবয়সে সহকর্মী এক বেজাতের হাত ধরে কিছুদিনের জন্যে একবার স্বামীর ঘর ছেড়ে জাত খুইয়েছিল। আমরা কোলকাতা এসেছি শুনে 'আস্ত ডিমের অর্ধেকটা দিয়ে' অতিথি সৎকার করতে অজয় ও বান্ধবী নমিতা মরিয়া হয়ে উঠে। যথাসময়ে দুজনে আমরা বিবাদীবাগ মুখি একটি বাসে চৌরঙ্গি থেকে চাপলাম। মিনিট দশেক পরে হঠাৎ একটি মহিলার আর্তচিৎকারে কড়া-ব্রেক চেপে বাসটি হোঁচট খেল। বুঝতে পারলামনা কি ঘটেছে, তবে বাস থামার পর দেখতে পেলাম কিছু বাসযাত্রী ও বাস কন্ডাক্টার সহ একটি উঠতি-বয়সী যুবককে টেনে হেঁচড়ে নীচে নামিয়ে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ট্রাফিক পুলিশের হাতে সঁপে দিল। বাকী পথে শুনলাম বাসের ভিতরে হাতল ধরে 'গ্যাংওয়ে'তে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলা চৌরঙ্গি থেকে ওঠার পর কে একজন ভীড়ের মধ্যে তার সংবেদনশীল স্থানে হাত চালিয়ে হন্যে হয়ে কি যেন অনুসন্ধান করছিল। অনুসন্ধানীর আবিষ্কারের আগেই মহিলাটি চিৎকার করে বাস থামাতে বললেন এবং হাতেনাতেই অনুসন্ধানকারীকে ধরিয়ে দিলেন। আমি ও আমার সহধর্মিনি বাসের ভেতরে এ 'যৌন-ঝাপটাবাজ' এর কীর্তিকলাপ শুনতে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমাদের পদ্মাপাড়ের জনপদে অহরহ বাসে এরকম কত ঘটনাই না ঘটছে, কে প্রতিবাদ করার সাহস রাখে, কার ঘাড়ে কয় মাথা? মহিলা প্রধানমন্ত্রি বা মহিলা বিরোধী-নেত্রীরা কে এই যৌন-নিপিড়ীতদের খবর রাখে! ওরা দুজন সতীনের মত একজনের চুল

বাস কন্ডাকটর নির্মলা মৈত্র একজন স্বার্থক নারী

আরেকজনে ছিঁড়তেই ব্যস্ত, আপামর জনসাধারনের মান সম্ভ্রমের কথা ভাববে কখন। মনে পড়লো সত্তুর দশকের শেষ থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়গুলোর কথা। এক-নাম্বার 'এপ্রোচ গেট' থেকে মেইন ক্যাম্পাস অবধি বাসের সীটে বসা নিরীহ ছাত্রির স্কন্দ-ঘেঁষে হাতল ধওে দাঁড়িয়ে থাকা কত যৌন-বিকৃত যুবক বিষ্ফোরনোম্মুখ পেন্টের জীপার ঘঁষে কত ভংগীমায় তাদের যৌনাকুতি জানিয়েছে। তবু কোন মেয়ে মুখ ফুটে বাস কন্ডাক্টার অথবা ড্রাইভারকে কড়া ব্রেক মেরে একটিবার বাস থামাতে সাহস পায়নি। লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে সহ্য করে গেছে সকল কষ্ট। ভয়ে হাঁটু-মাথা এক করে মুষড়ে থাকে, ভাবে 'পাছে লোকে কিছু বলে।' বিবাদীবাগের পথে বিবাদীর বিরুদ্ধে নারী অধিকার ও দাবীর যে সোচ্চার কণ্ঠ আমরা দুজন সেদিন শুনেছি তা কখনো পদ্মাপাড়ের জনপদে আগে কেন শুনিনি, লজ্জায় কাউকে আমরা তা জিজ্ঞেস করিনি। আর তাই সেই অজানা প্রশ্নের উত্তরগুলো আজো অজানাই রয়ে গেল আমাদের কাছে। শুনছি কোলকাতায় নাকি নব্বুই দশকের গোড়া থেকেই পেট্রল-ষ্টেশনে পুরুষদের সাথে সমানভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই সাথে কুমারী-যুবতী-নারী সকলেই কাজ করে যাচ্ছে। কারো মনে কোন সংশয় অথবা দ্বিধা নেই। নারী স্বাধীনতা কি অথবা নারী অধিকার কি, কয়জন নারী বাংলাদেশে তার অধিকার সম্পর্কে জানে? অষ্ট্রেলিয়াতেও 'প্রবাস আলোকিত' করার নামে প্রতিনিয়ত নিজগৃহে স্ত্রীনিধন করে কত মুখোশধারী। আবার হাসিমুখে সে কাপুরুষরা বাইরে এসে সবাইকে বলে বেড়ায় 'বাংলা আমার মায়ের ভাষা', 'একুশ আমার জন্মদিনের মাস', 'মার্চ আমার মায়ের বিবাহদিবস মাস' অথবা 'ডিসেম্বর আমার মায়ের জন্মদিবস মাস' ইত্যাদি। সত্যিকারার্থে কয়জন বাংলাদেশী সুপুরুষ আমরা নারী অধিকার নিয়ে ভাবি, কয়জন বাংলাভাষী নিজগৃহে নারীদের সন্মান করি। অথচ আজানুলম্বিত ঘোমটা ও শাঁখা-সিঁদুরে শৃঙ্খলিত পদ্মাপাড়ের নারীরা আজো 'স্বামীর পায়ের নীচে বেহস্ত' অথবা 'প-প-গু' (পতি পরম গুরু) বলে সলাজে অহরহ জিব কেটে রক্তাত্ত করে। গ্রামে-গঞ্জে এখনো 'হাদিচে বুলিছে, কুরানে লিকিছে' এ ধোঁয়াতে আচ্ছাদিত করে নারী অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

নব্বুই দশকের উষালগ্নে নারী স্বাধীনতা ও তাদের অধিকার সম্পর্কে গঙ্গাপাড়ে যে দৃশ্য আমি দেখেছি তা থেকেই আমার জিজ্ঞাসু অনেক প্রশ্নের 'উত্তর-ইংগিত' আমি জীবনের ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে খুঁজে পেয়েছি। তাই কাউকে জিজ্ঞেস করিনি, জানতেও চাইনি, 'কেন ওখানে হয়? কেন এখানে নয়?' তার উত্তরে আজো আমার কর্ণকুহরে শুধু প্রতিধ্বনিত হয়, 'কি দাদা, ঘিরে থাকবেন নাকি?'

বিশ্বনারী দিবসে প্রানাধিক সহধর্মিনী ভেরোনিকাকে উৎসর্গ করা আমার এ লেখাটি। বনি আমিন, সিডনী, ০৮/০৩/২০০৬